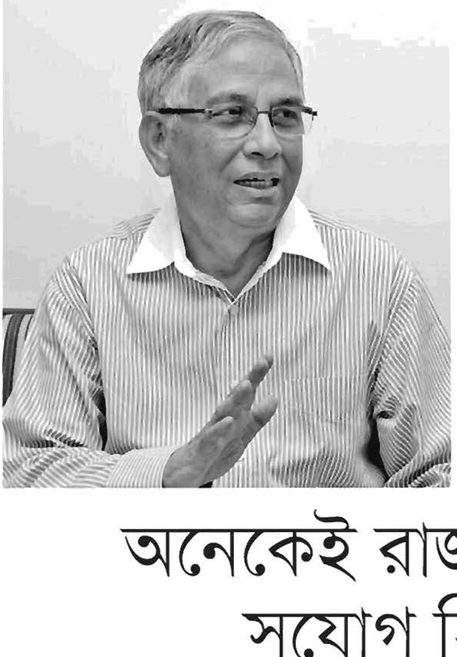

সাক্ষাৎকার | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। বর্তমানে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সদ্য সাবেক পে-কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে যোগ দেন এ বিভাগেই। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি অগ্রণী ব্যাংক, সাধারণ বীমা করপোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদেরও সদস্য ছিলেন। আহ্‌সানিয়া মিশন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে 'খান বাহাদুর আহ্‌সান উল্লাহ গোল্ড মেডেল- ২০১৩' প্রদান করে। সম্প্রতি তিনি দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিনিয়োগ, ব্যাংক, মুদ্রানীতিসহ নানা বিষয় নিয়ে *বণিক বার্তার* সঙ্গে কথা বলেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এম এম মুসা**

অনেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সুযোগ হিসেবে দেখছেন

বিশ্বের বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করছে। আমরা কি সে অনুযায়ী এগোতে পারছি?

উদীয়মান বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতি নিয়ে বিশ্ববাসীর আগ্রহের কমতি নেই। বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূলে আছে সবকিছু। বিশ্ব মিডিয়ায় উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের অর্থনীতি সাবলীলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং শক্তিশালী একটি অর্থনীতি হতে চলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু সাময়িকভাবে তা হোঁচট খেয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। বিশেষ করে গত দুই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আমাদের অর্থনীতিতে। সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতির সূচকগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দিতে হবে। রফতানি আয়, রেমিট্যান্সপ্রবাহ, মুদ্রা সরবরাহের দিকে তাকালে দেখা যাবে বড় ধরনের পতন এখনো হয়নি এক্ষেত্রে। তবে একটু ধীরগতিতে এগোচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতিতে উত্থান-পতন থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী, সেটা বুঝতে হবে। সর্বশেষ হিসাবে অবশ্য রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি, বন্দরে পণ্য খালাসের গতি এবং রেমিট্যান্সপ্রবাহে ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে।

করপোরেট খাত, সরকারি শিল্প খাত কিংবা ব্যাংকিং খাত এ ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতায় একটি খাত বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যা আমাদের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। খাতটি হলো কৃষি। কৃষাণ-কৃষাণিরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছেন না। তাদের সংসার চলছে না। তারা দিন আনেন দিন খান। আর্থিকভাবেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পরবর্তী মৌসুমে কৃষক যে ফসল উৎপাদন করবেন, সে সুযোগও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তারা ঋণ নেন। সেটাও তাদের পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদক শ্রেণী একটা বিপজ্জনক অবস্থানে চলে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সেদিকে আমাদের সবার নজর দেয়া উচিত। সরকার বিভিন্নভাবে মহাসড়কগুলোয় পাহারা দিয়ে যান চলাচল সচল রেখেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কৃষাণ-কৃষাণিকে এ সুযোগের আওতায় আনতে হবে, যাতে তারা ক্ষতির সম্মুখীন না হন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের ঋণ সুবিবেচনায় নিতে সব ব্যাংককে অনুরোধ করেছে। এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

আরেকটি খাত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটি হলো পর্যটন। প্রতিশ্রুতিশীল একটি খাত এটি। স্বল্প সময়ে এ ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। পর্যটনের একটা মৌসুম আছে আর সেটা এখন চলছে। তাদের বুকিং যা হয়েছিল, সেটাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে এ খাতের পুনরুত্থানের প্রণোদনায় যেতে হবে।

তার পর আসে আমাদের ভাবমূর্তি রক্ষার প্রশ্ন। আমাদের ভাবমূর্তি এখন হুমকির সম্মুখীন। এভাবে সন্ত্রাস, সহিংসতা, পেট্রল বোমা, ককটেল হামলা চলতে থাকলে আমাদের সামনে যে সুযোগ আছে, সেটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। জাপান সম্প্রতি বলেছে, তারা চীন থেকে তাদের বিনিয়োগ ভারত, বাংলাদেশ, ভিয়েতনামের মতো দেশে সরিয়ে নিতে চায়। এমন সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করলে ভারত এবং ভিয়েতনামের দিকে পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আমাদের সুযোগ কমে আসবে। পরবর্তীতে এ সুযোগ আবার কবে ফিরবে, তাও বলা যাবে না। চীন বলছে, তারা তৈরি পোশাকের মতো শ্রমঘন শিল্পে আর বিনিয়োগ করবে না। অর্থাৎ আমাদের সুযোগ এখানে অনেক বেশি। রাজনৈতিক অস্থিরতায় আমরা অনেকটা পিছিয়ে যেতে পারি। এর সমাধান করে পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে সম্ভাবনার দ্বারগুলোকে আবারো খুলে দিতে হবে।

এক্ষেত্রে করণীয় কী?

আমরা বলেছি, পেট্রল বোমা কিংবা ককটেল সন্ত্রাস বন্ধ না হলে আলোচনা হবে না। কিন্তু আলোচনা তো হতেই হবে। আলোচনা যে কেবল দুই নেতার মধ্যেই হতে হবে, এমনটা নয়। পরিবেশ স্বাভাবিক করতে সবক্ষেত্রেই আলোচনা হতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশে এমনটি হয়ে থাকে। আমি যতটুকু জানি, যে দলগুলো আন্দোলন করছে, তাদের অনেক নেতাও মনে করছেন এ সহিংসতা বন্ধ হওয়া উচিত। কেননা তারা মনে করছেন, জনগণের সমর্থন হারাচ্ছে দলগুলো। এছাড়া এটা অমুক দল কিংবা তমুক দলের কোনো সমস্যা নয়। এটা আমাদের পুরো জাতি ও দেশের সমস্যা। দেশের অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা এটি। এখানে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এখন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রকৃত অর্থে দেশে কোনো হরতাল হচ্ছে না। মাঠে বিরোধী কর্মীদের উপস্থিতি নেই। এ খবরগুলো গণমাধ্যমে বেশি করে আসা উচিত। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখতে হবে। অনেকেই বোমা বানাতে গিয়ে আহত হচ্ছে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ছে, সেটা মিডিয়ায় আসছে। এটা ভালো দিক। এভাবেই আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করতে পারি। যাদের গাড়ি এ পরিস্থিতিতে পেট্রল বোমা হামলায় পুড়ে যাচ্ছে, তাদের সাহায্য দেয়ার কর্তব্যটি সরকার করে যাচ্ছে। যারা আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে, তাদেরও বড় অঙ্কের সাহায্য দিতে হচ্ছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। সহায়তার হাত যত বেশি প্রসারিত হবে, মানুষের সাহস তত বাড়বে এবং পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তারা সরকারের কাছে বড় অঙ্কের অর্থসহায়তাও চেয়েছেন। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ আছে। আমি পুরো বিষয়টি একটু নেতিবাচকভাবে দেখছি। কেননা ব্যবসায় লাভ কিংবা লোকসান হবে— এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যদি সবাই ঢালাওভাবে ক্ষতিপূরণ চাইতে থাকেন, তাহলে তো সমস্যা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তারা সহায়তা চাইতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সব রকমের সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এটা দুঃখজনক, অনেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সুযোগ হিসেবে দেখছেন। সে কারণেও অবিলম্বে সহিংসতা, খুন-খারাবি বন্ধ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

শিল্পায়নে আমরা কি সঠিক পথে আছি?

তৈরি পোশাক খাত অবশ্যই সম্ভাবনাময়। কিন্তু এর পরও আমাদের উৎপাদন এবং রফতানি বহুমুখীকরণ করতেই হবে। আমি যতটুকু জানি, স্কয়ার ফার্মা আমেরিকার বাজারে তাদের ওষুধ রফতানির অনুমতি পেয়েছে। আগামী দু-তিন মাসে বেক্সিমকোও অনুমতি পেয়ে যাবে এবং ছয়-সাত মাসের মধ্যে ইনসেপ্টাও সে বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। এ বাজার উন্মুক্ত হলে আমাদের অর্থনীতিতে ১০ থেকে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত রফতানি আয় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এমনকি একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই ১০ বিলিয়ন ডলার রফতানি হতে পারে। তারা এ সুযোগ পেতে ছয়-সাত বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম ও অবিরাম কাজ করে আসছে। অনেকাংশে বিনা শুল্কে এবং স্বল্প শুল্কে কাঁচামাল আমদানির মাধ্যমে ওষুধ শিল্প আজ এ পর্যায়ে এসেছে। তবে ১৯৮৩ সালের ওষুধনীতির পরিমণ্ডলে অসাধারণ উদ্যোক্তারাই এ অর্জনের কৃতিত্বের দাবিদার। সেক্ষেত্রে সরকারকে এ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়নে সাহায্য-সহায়তায় উদারতা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম কাপড় আমদানিকারক দেশ। কিন্তু এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। কাপড় আমদানি কমিয়ে আনতে হবে। এতে তৈরি পোশাক খাত আরো শক্তিশালী হবে। স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পোশাক তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এতে ভ্যালু এডিশন বাড়বে, ৪২ দিনের লিড টাইম অনেক কমে যাবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। স্থানীয়ভাবে কাপড় তৈরি করলে বস্ত্র আমদানিতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, তা অনেক কমে আসবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই কাপড়ের মান বাড়াতে হবে এবং সেটা আমাদের শিল্পপতিরা করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। কেননা তারা অনেক উদ্যমী। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিন শিথিলের ফাঁদে পা দিতে চলেছে। অনেকে বিষয়টিকে ইতিবাচক ভাবলেও আমি বলব তা নেতিবাচক। এতে আমরা শুধু দর্জিগিরিতে নেমে যেতে পারি।

সিরামিক তৈজসপত্র শিল্প বেশ সম্ভাবনাময়। বিদ্যুৎ-গ্যাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে সিরামিক তৈজসপত্র তৈরি অনেক বাড়ানো যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের অদক্ষ ব্যবহার কমাতে হবে। সরকারকে এ খাতের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের তৈরি সিরামিক পণ্য বিশ্বে স্বনামধন্য। সুযোগ করে দিলে তৈরি পোশাকের মতোই ভূমিকা রাখবে এটি। এরও কয়েক বিলিয়ন ডলারের রফতানি বাজার রয়েছে। চামড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাত। ১৯৯৪ সালে একটি কেন্দ্রীয় শোধনাগার প্লান্ট মঞ্জুরি হিসেবে দিতে চেয়েছিল নেদারল্যান্ডস সরকার। নেয়া হয়নি। কারণ অজ্ঞাত। পরবর্তীতে ২০০২-০৩ সালে তা বেশ সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছিল। এখনো হাজারীবাগ থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে সাভারে স্থানান্তর করা গেল না চামড়া শিল্প। হাজারীবাগের ব্যবসায়ীরা নাকি এখনো জমির মূল্য নিয়ে দরকষাকষি করছেন। ১০ বছর আগের ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্প এখন ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। তার পরও প্রকল্পটি অতি শিগগিরই বাস্তবায়ন হোক। এ খাত থেকেও বছরে ৮ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় করা সম্ভব।

আমাদের আইসিটি খাত স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এখন পর্যন্ত এটা মূলত অভ্যন্তরীণ খাত হিসেবেই চাহিদা মেটাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সফটওয়্যার রফতানি করে ৫০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয়ের লক্ষ্য স্থির করেছে। সেখানে আমরা অন্তত প্রাথমিকভাবে আগামী পাঁচ বছরে ৫ বিলিয়ন বাজারের লক্ষ্য স্থির করতেই পারি। এক্ষেত্রে মৌলিক আইনি কাঠামো, নজরদারি আইন ও নজরদারি প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। যারা আইসিটি রফতানি করছেন, তাদের অধিকাংশই নাকি দেশে তেমন অর্থ আনছেন না। কেননা আমাদের কপিরাইট আইন নেই। নকলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি। সরকার এ বিষয়ে সহসাই নজর দেবেন বলে মনে করছি। কেননা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং সে সময়ে অনেকেই তা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ এখন সত্যিই ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

ব্যবসায় লাভ কিংবা লোকসান হবে— এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যদি সবাই ঢালাওভাবে ক্ষতিপূরণ চাইতে থাকেন, তাহলে তো সমস্যা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তারা সহায়তা চাইতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সব রকমের সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এটা দুঃখজনক, অনেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সুযোগ হিসেবে দেখছেন। সে কারণেও অবিলম্বে সহিংসতা, খুন-খারাবি বন্ধ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে

সম্ভাবনার সফল বাস্তবায়নে অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি। সেক্ষেত্রে কি আমরা পিছিয়ে পড়ছি না?

গ্যাস-বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা। প্রতিদিন সে চাহিদা মেটাতে হবে। তা না করতে পারলে অনেক সমস্যা তৈরি হবে। সরকারের উদ্যোগের ফলে আবাসিকে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে; কিন্তু শিল্পের চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয়নি। গণখাতের চাহিদা মেটানোয় বেসরকারি শিল্প হয়তোবা একটু পক্ষপাতিত্বের শিকার হচ্ছে। সরকারকেই এ অবস্থার সমাধান করতে হবে। বিদ্যুতের জন্য ছোট, মাঝারি ও বড় প্রকল্প হাতে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকার সঠিক পথেই যাচ্ছে। ভারত, মিয়ানমার, নেপালের কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত সঠিক। এখন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৃষ্টি দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের দেশে কয়লা থেকে ভালো বিকল্প জ্বালানি নেই। আমাদের দেশে যে পরিমাণ কয়লা রয়েছে মাটির নিচে, তা থেকে আগামী ৩০ থেকে ৫০ বছরের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো যাবে। বিষয়টি সোনার বাংলা গড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। রংপুর-দিনাজপুরের সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আলোচনা করে— ক) বাজারমূল্যের কয়েক গুণ বেশি ক্ষতিপূরণে জমি অধিগ্রহণ। খ) কোলবাংলা কোম্পানিতে তাদের শেয়ার মালিকানা প্রদান। গ) কোম্পানিতে তাদের পোষ্যদের কর্মসংস্থান। ঘ) সন্তোষজনক স্থানান্তরের ব্যবস্থা নিয়ে এবং ঙ) পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিতে দুই অঙ্কের বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধিতে যেতে হবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংক আমাদের সাহায্য করবে না বলে বসে একসময়ে। তারা ভুল করেছিল, আমরা তাদের সাহায্য না পেয়ে দমে যাইনি, প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে পিছিয়ে আসিনি। পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এখনো ইচ্ছা করলে আসতে পারে— দরজা খোলা রাখাই সঠিক হবে। গভীর সমুদ্রবন্দর বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এ প্রকল্পে সাতটি দেশ কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সরকার এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করা যায়। সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় আমাদের নীল অর্থনীতির বিশাল সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। আরেকটি বাংলাদেশ এখন আমাদের হাতে। আমাদের প্রথম কাজ একে রক্ষা করা। সেজন্য সশস্ত্র বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সমুদ্রে আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রয়েছে। তার জন্য বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্বে বছরে ১ লাখ ৮০ হাজার বিলিয়ন ডলারের মতো বিদেশী বিনিয়োগ হয়। সেখানে আমরা কেন ১ হাজার কিংবা দেড় হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ পাব না? এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডকে শক্তিশালী করার চিন্তা করা যায়। ভারতে বিনিয়োগ বোর্ড ওয়ানস্টপ ওয়ান ডে নিবন্ধন সেবা দেয়। আমরা পাঁচ কর্মদিবসে নিবন্ধন নিশ্চিত করে বিনিয়োগ বোর্ডের হাতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সংযোগের ২ শতাংশ বরাদ্দ ক্ষমতা দিতে পারি। সর্বোত্তম মানবসম্পদ নিয়োগ করে বিনিয়োগ বোর্ডকে শক্তিশালী করতে পারলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে। কেইপিজেডের সমস্যা বিদেশে আমাদের গৌরবকে ম্লান করছে বটে। এটি দ্রুত সমাধান করতে হবে।

নানা উদ্যোগ নেয়ার পরও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে না কেন?

জমির স্বল্পতা এক্ষেত্রে অনেক বড় সমস্যা। বিনিয়োগ বোর্ড একা এ সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। বিনিয়োগ বোর্ডকে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ জমির সমস্যা সমাধান করলে বিনিয়োগ বোর্ড তাদের জন্য অবকাঠামোর সুবিধা নিশ্চিত করবে। আবাসিক খাতে গ্যাসের বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্প খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। পাইপের মাধ্যমে আবাসিকে গ্যাস দেয়ার ব্যয়বহুল বিলাস বাদ দিতে হবে। সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবহার করলে গ্যাসের প্রয়োজন কমবে। অপচয়ও কমে যাবে। উৎপাদনশীল শিল্পে একইভাবে গ্যাসের সরবরাহ বাড়াতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম বড় খাত জনশক্তি রফতানি ও রেমিট্যান্স। এটি আরো গতিশীল করে তুলতে কী ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন?

এ খাতের সম্ভাবনাও অসীম। বাংলাদেশে যেখানেই হাত দেয়া হয়, সেটা সোনা হয়ে যায়। উৎপাদনের দুটি বড় উপাদান শ্রম ও মূলধন। যেখানে শ্রম বেশি থাকে না, সেখানে শ্রমের বিপরীতে যন্ত্র তথা মূলধন বাড়াতে হয়। আবার যেখানে শ্রম বেশি, সেখানে মূলধন কম থাকে। উভয়ই একে অন্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। উন্নত দেশে শ্রম এখন অনেক দুষ্প্রাপ্য বলতে হবে। সেজন্যই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন শিথিল করেছেন। জনসম্পদকে স্বাগতম জানিয়েছেন। ইউরোপও একই পথে হাঁটছে। তাই আমাদের শ্রমবাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করছে এবং বিজ্ঞান পড়ছে না, তারা শ্রমবাজারে কোনো কাজে আসছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার শঙ্কা বেড়ে যায়। মাদ্রাসা শিক্ষার ন্যূনতম কোর সিলেবাস পড়ানোর পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া গেলে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্মসংস্থান হবে। সেখানে তাদের চাহিদা অনেক। ভাষা ও ধর্মজ্ঞানে তাদের যে সুবিধা রয়েছে, তার সঙ্গে বৃত্তিমূলক জ্ঞান ও দক্ষতা যুক্ত হলে তাদের চাহিদা বিদেশের পাশাপাশি দেশেও বাড়বে। তবে এ বিষয়ে জোর-জবরদস্তি না করে আলাপ-আলোচনা সমঝোতায় আসতে হবে।

ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের প্রধান রফতানি বাজার। রাজনৈতিক অস্থিরতার কোনো প্রভাব সেখানে পড়বে কি?

যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা বাতিল করেছে রাজনৈতিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে নয়। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি তেমন হয়নি। তবে এটি যদি আমাদের ইউরোপীয় রফতানি কমিয়ে দেয়, তাহলে খুবই চিন্তার কারণ হবে। তবে ইউরোপ আমাদের বিষয়ে এখনো সহানুভূতিশীল। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রতি অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডে আমেরিকা এবং ইউরোপ অনেক বেশি সমালোচনা করেছে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অনাচার, সহিংসতা ও পেট্রল বোমা, ককটেলের বিষয়টি তাদের আরো বেশি বেশি বোঝাতে হবে। তাছাড়া ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও আমাদের বাজার তৈরি হচ্ছে। চীন এবং ভারত ভারী শিল্পায়নের দিকে চলে যাবে। তারা ক্রমবর্ধমান মজুরি খরচের কারণে শ্রমঘন শিল্প থেকে সরে গিয়ে মূলধন ঘন ভারী শিল্পের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ছে। আগামীতে তারা আমাদের কাছ থেকে কাঁচামাল এবং তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য শ্রমঘন শিল্প পণ্য আমদানি করবে। তৈরি পোশাককে বহুমুখীকরণ করতে হবে। রফতানি বাজার এবং ডিজাইনসহ উন্নত মানের পোশাকে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি ও কার্যকর ব্যাংকিং খাত প্রয়োজন।

কিন্তু বর্তমান মুদ্রানীতি তো সম্প্রসারণশীল নয়—

বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে সংকোচনশীল মুদ্রানীতি। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনশীল মুদ্রানীতি অনুসরণ করে গত আড়াই বছরে তা নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এটি প্রশংসার দাবি রাখে। এখন অর্থনীতি ভালো, গতি সম্প্রসারণশীল। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে মূল্যস্ফীতি ভবিষ্যতে আবারো হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ঋণপ্রবাহ বিশেষ করে বেসরকারি খাতের জন্য কঠিনভাবে হ্রাস না করে উন্মুক্ত রাখা সমীচীন, যাতে সম্প্রসারণশীল প্রবৃদ্ধি তথা কর্মসংস্থান হতে পারে। অর্থনীতি সম্প্রসারণ হলেও মূল্যস্ফীতি বাড়বে। সেটা আমাদেরকে তখন নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। অনেক বিনিয়োগকারী বলছেন, ঋণের সুদের হার বেশি হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। সুদের হার বাজার ঠিক করবে বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বাজার বিভক্ত। ঋণের সুদের হার বাজার নয়, ঠিক করছে কতিপয় ব্যাংক মালিকের সিন্ডিকেট। এটি প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করছে না। অর্থের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। মুদ্রাবাজার ঠিক করা সরকারের দায়িত্ব নয়। তারা শুধু একটা গাইডলাইন দেবে। ব্যাংক মালিকরা যদি চান তারা আইন না মেনে মুনাফা করবেন, তাহলে কিছু করার নেই! কারণ ব্যাংকের তো মুনাফা অর্জন করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার উচিত হবে কুক্ষিগত করে রাখার ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা।

মূলধন বাজারের নীতি পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। যদি একজন স্পন্সর ডিরেক্টরকে বলে দেয়া হয় যে, পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ২ ভাগ বিনিয়োগ না করতে পারলে তিনি ডিরেক্টর হতে পারবেন না, তাহলে তো তাকে নিরুৎসাহিত করা হলো। একটা করপোরেট কোম্পানির ক্ষেত্রে ৫০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন হলে তার শতকরা ২ ভাগ দেয়া সহজ। কিন্তু ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন যদি ১ হাজার কোটি টাকা হয়, তাহলে শতকরা ২ ভাগ প্রদান করে উদ্যোক্তা পরিচালক হওয়া কঠিন বৈকি। ফলে অনেকে বিনিয়োগে বা শেয়ারবাজারে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। ব্যাংক বলে তারা স্পন্সর ডিরেক্টর পায় না। আমাদের দেশের বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটাই, তারা মূলধন সংগ্রহ করতে পারছে না। এত টাকা কেউ বিনিয়োগ করতে পারছে না। সরকারকে এদিকে আশু নজর দিতে হবে। এ বিষয়ক নীতিকে যৌক্তিকীকরণ করা হলে মূলধন বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সর্বশেষ আপনার পরামর্শ কী থাকবে?

এখন বিশ্বায়নের যুগ। জাপান, চীন, মিয়ানমার, ভারত আমাদের সঙ্গে সখ্য গড়তে চায়। সেটা তারা খোলামেলাভাবেই বলছে। পৃথিবীর চারটি অর্থনৈতিক পরাশক্তির তিনটিই আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চায় এবং আমাদের সম্ভাবনার ভাগীদার হতে চায় তারা। একসঙ্গে কাজও করতে চায়। সেক্ষেত্রে এ তিন দেশ আমাদের প্রতিবেশীও। তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের মতো, চীন এ হার পার করেছে অনেক আগে। তাদের এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ আমাদেরও নিতে হবে।

শ্রুতিলিখন : **মুহাম্মাদ হাসান রাহফি**

আলোকচিত্রী : **রিচার্ড রোজারিও**